আল্লাহ্ হাফিজের দেশে

আকাশ মালিক

(২)

এই ঘাট-পাড়ে বসে বই পড়া ছিল আমার নিত্যদিনের অভ্যেস। নাস্তার জন্যে ডাকাডাকি করতে করতে শেষ পর্যন্ত ভাবী ঘাটেই চা-নাস্তা পাঠিয়ে দিতেন। এবার চা নিয়ে আসলেন আমার স্ত্রী। মলিন চেহারায় জিজ্ঞেস করলেন-

- সাতটা ল্যাগেজ কি বাতাসে উড়ে গেল? সারা রাত আমার ঘুম নেই। এতগুলো মানুষ এক কাপড়ে কয়দিন কাটাবে? সিলেট বদরুল ভাইয়ের কাছে একটা ফোন করুন না।

- ফোন করে লাভ হবেনা, বদরুল নিজেই ফোন করেছিল। ঢাকা থেকে পরবর্তি ফ্লাইট সিলেট না আসা পর্যন্ত কিছু বলা যাবেনা।

- কিন্তু আমাদের ল্যাগেজতো ঢাকা নামানোর প্রশ্নই উঠেনা। কাস্টমস্ হলো ল'কেল এয়ারপোর্টে। ইংলিশ মহিলা বল্লো যে তোমাদের ল্যাগেজ সিলেট পাবে। হিথ্রো টু সিলেট ডাইরেক্ট এয়ারবাসের ফ্লাইট। বিমান থেকে আমরা নামলাম না অথচ আমাদের ল্যাগেজ নামলো কিভাবে? ল্যাগেজের টাগেও সিলেট লিখা। তারপর ল্যাগেজগুলোর চতুর্দিকে সিলেটের ঠিকানাই লিখা, ঢাকাতো কোথাও লিখা নেই। আপনি মেঝো ভাইয়ের সাথে আলাপ করে একটা কিছু করুন প্লীজ।

- জানো, আমাদের চেয়ে মেঝোভাই, বড়ভাই, ল্যাগেজ নিয়ে অনেক বেশী চিন্তিত। তারা যে কি অস্থিরতায় আছেন তুমি তা দেখো নাই। যাও নাস্তা-টাস্তা করো, ল্যাগেজের জন্যে মনঃক্ষুন্ন হয়ে বসে থেকোনা। বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখো এমন মনোহরী দৃশ্য পৃথিবীর কোথাও দেখতে পাবেনা। তোমার মাথার ওপরে চেয়ে দেখো গাছটিতে ছোট ছোট কত আম ধরেছে। দুই মাস থাকলে পাঁকা আম খেয়ে যেতে পারবে। পুকুর পাড়ে দুই পাশে সুপারি গাছগুলো যেন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত গাইতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। '*ওমা ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে---*'

- আপনি জাতীয় সঙ্গীত গাইতে থাকুন আমি চল্লাম।

মাকে চলে যেতে দেখেই বড় মেয়েটি বল্লো-

- আব্বু, হিস্টরিকেল পন্ড !

- ও হ্যাঁ। আচ্ছা, পুকুরের ঐ শাপলা ফুলটাতো তোমরা নিশ্চয়ই চেনো ? তার অনেক ছবি এঁকেছো, ইংল্যান্ডেও বহু যায়গায় দেখেছো। কিন্তু তোমাদের সামনে ঐ যে ময়ুর-পুচ্ছের মত কত ফুল ফোটে আছে, ওগুলোর নাম কি জানো? ওগুলোর নাম হচ্ছে কচুরি-পানা। এদের শেকড় লম্বা লম্বা চুলের মত। ছোটবেলা একবার চাঁদনী রাতে কচুরি-পানার শুকনো শেকড় দিয়ে হেই মোটা দাঁড়ি আর মাথায় ঝাকড়া চুল লাগিয়ে তোমাদের এক গ্রান্ড গ্রান্ড মাকে ভয় দেখিয়েছিলাম। ঐ পাড়ে পুকুরের পূর্ব দক্ষিণ কোণে একটা বিরাট শিমুল গাছ ছিল। বহু যুগ আগে দৈত্য-দানবেরা নিশীত রাতে গাছটিতে বসে মিটিং করতো আর তাদের সাথে একজন জলপরী এই ঘাটে স্নান করতে আসতো।

- সাউন্ডস্ লাইক এ বেড্-টাইম ষ্টরি।

- আরে না, বেড্-টাইম ষ্টরি না। গ্রামের সবাই তখনো বিশ্বাস করতো এখনো করে। দানবেরা যখন আসতো অনেক ডেক-ডেক্চি ধন-দৌলত নিয়ে আসতো। পুকুরের জলের নীচে ওসব তারা লুকিয়ে রাখতো। বাড়ির একজন মহিলা

একদিন সুর্য্য ওঠার আগে স্নান করতে এসে দেখেন, একটি তামার কলসী পুকুরে ভেসে বেড়াচ্ছে। কলসীর ভেতরে প্রচুর কাঁচা টাকা।
- ইউ মিন্ কয়েন?
- ইয়েস্, অন্যভাবে বলা যায় রৌপ্য-মুদ্রা। মহিলা কলসী নিয়ে বাড়ি চলে যান। কিন্তু দানবের টাকা তাঁর কোন কাজে আসলো না। ঐ টাকা শুধু দানব দেশেই চলে। এরপর থেকে আমাদের পুকুরটির নাম হলো 'টাকার মা'র পুকুর'।
- এখন আর কলসী ওঠেনা?
- না। ওঠবে কি ভাবে? জৈন্তা পাহাড় থেকে বড় পীর ডেকে আনা হলো। পীর সাহেব সকল জ্বীন-ভুত, জল-পরী, দৈত্য-দানব তাড়িয়ে দিয়ে শিমুল গাছটা কেটে ফেলার হুকুম দিলেন। এরপর থেকে তারা আর এ বাড়িতে কোনদিন আসেনি। এবার বলো কেমন লাগলো ইতিহাসটা।
- ইতিহাস হলেতো বইয়ে লিখা থাকতো। বই আছে?
- না। তবে এরকম আরো কয়েকটা ঘঠনা আছে যা আজও কেউ অবিশ্বাস করেনা। তোমাদের কি বিশ্বাস হয় নাই?
- মোঠেই না।
- কেন?
- ইংল্যান্ডে মাটির অনেক গভীরে পাওয়া, সাক্সান, রোমানদের ফেলে যাওয়া এরকম কলসী, মুদ্রা আমরা মিউজিয়ামে অনেক দেখেছি। সত্যি যদি কলসী ভেসে ওঠে থাকে, বাংলাদেশের আরকিওলজিষ্টদেরকে দেখানো উচিৎ ছিল। তারা কলসী ও মুদ্রা দেখে বলতে পারতো এর বয়স কতো এবং কার যুগের।
- আচ্ছা, দু সপ্তাহ পরে আমরা আবার সিলেট যাবো। তোমাদেরকে বাংলাদেশের বিখ্যাত একজন দরবেশ অর্থাৎ হারমিটের কবর দেখাবো। মনে আছে সিলেট শহর থেকে বেরুবার পথে ব্রীজের ওপর থেকে তোমাদেরকে একটা বড় নদী দেখিয়েছিলাম? হারমিট তাঁর ৩৬০ জন সঙ্গী নিয়ে ভরা নদীর জলের ওপরে জায়নামাজ বিছায়ে নদী পার হয়েছিলেন। শুধু তা-ই নয়, নদীর অপারে গৌড় গোবিন্দ নামে এক হিন্দু বাদশাহ বাস করতেন। হারমিট এপার থেকে যখন আজান দিলেন, অপারে গৌড় গোবিন্দের সাত-তালা বিল্ডিং ধড়ধড় করে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়।
- এনাদার ফেয়ারী-টেইল ষ্টরি?
- আগে কবরটা দেখো, গৌড় গোবিন্দের বাড়িটা দেখো। তা ছাড়া সোনার কৈ-মাগুর, জালালী কবুতর, পালক দিয়ে অজস্র পাখি তৈরী, বাঘের বিচার, অলৌকিক গজার মাছের ইতিহাসতো শুনলেনা। সব কিছু দেখে শুনে তারপর কমেন্ট করো।

দু-দিন পর টেলিফোন আসলো ল্যাগেজ সিলেট এয়ারপোর্ট এসেছে। ২৪ শো টাকা দিয়ে গাড়ি রিজার্ভ করে আমি আর মেজো ভাই এয়ারপোর্ট পৌছুলাম। ল্যাগেজ কাস্টমসের হাতে। ১০ হাজার টাকা না দিলে ল্যাগেজ ছুটানো যাবেনা। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তারা বল্লেন-
- এর কোন একটার ভেতরে অবৈধ মাল আছে।
- কোন অবৈধ মাল নেই। আছে শিশুদের খাবার ও কিছু কাপড়-চোপড়।
- চাবি দেন সবগুলো ল্যাগেজ খোলে দেখতে হবে।
- চাবি তো সঙ্গে আনি নাই।
- তাহলে তালা ভাঙ্গতে হবে।
- তালায় হাত দেবেন না প্লীজ।

এ পর্যায়ে এসে মেজোভাই আমার হাত ধরে টান দিলেন। বদরুলকে ডেকে বল্লেন আমাকে নিয়ে বাইরে চলে যেতে। আধ ঘন্টা পর ল্যাগেজ নিয়ে গাড়িতে এলেন। ল্যাগেজগুলো ঠিকটাক আছে কি না আর দেখার মুড নেই। আমি জানি ভাই কি করেছেন। ১০ হাজার টাকা তাদেরকে দিয়েছেন, আর তারা বলেছে 'আল্লাহ হাফিজ'।

পরের দিন ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম-
- কাস্টমস্কে কত টাকা ঘুষ দিলেন?
- টাকাটা বড় কথা নয়। একবার তোর বউয়ের দিকে চেয়ে দেখেছিলে? ল্যাগেজগুলো দেখে আনন্দে তার চোখে জল এসেছিল। ভাতিজা ভাতিজিদের চোখে-মুখে কি আনন্দ। আল্লাহর শুকরিয়া ল্যাগেজগুলো ভালয় ভালয় যে পেয়েছি। দুই হাজার টাকা কম নিয়েছে, আট হাজার টাকা দিয়েছি।
- প্রথম দিন পাসপোর্টে সীল লাগাতে কত টাকা দিলেন?
- শুনো। দেশটা আগের মত আর নেই। সাধারণ মানুষ জিম্মি হয়ে গেছে অসৎ রাজনীতিবিদ ও আমলাদের হাতে। ১৪ কোটি মানুষের জীবন তাদের দয়া-করুণার ওপর নির্ভরশীল। কাস্টমস্ অফিসে তুমি যখন তর্ক জুড়ে দিয়েছিলে আমার মনে পড়লো তোমাদেরই দুই প্রবাসী বাঙ্গালী ঢাকা এয়ারপোর্টে খুন হয়েছিল। খুনিরা আজও এয়ারপোর্টেই আছে কেউ ধরা পড়েনি। গত মাসে পাশের বাড়ির শাহীন ইংল্যান্ড থেকে এসেছিল। একমাস পরে ইংল্যান্ড ফিরে গেছে তার ল্যাগেজের কোন পাত্তাই নেই। বাড়ির যাবতীয় খরচ সহ টাকা কোথায়, কতটা লাগে, তা আমার ওপড় ছেড়ে দাও। তোমরা যতদিন বাড়ি আছো আমি চাইনা তুমি, তোমার বউ, আমার ভাতিজা ভাতিজীগুলোর ওপর কোন প্রকার কষ্টের ছায়া পড়ুক। আরেকটা কথা তোমাকে আগেই বলে রাখি। কাউকে টাকা দিয়ে সাহায্য করার চেষ্টা করবেনা। সাহায্যের জন্য কেউ আসলে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। ১৪ কোটি মানুষের মধ্যে ১৩ কোটিই ভিক্ষুক, ১ কোটি মানুষ পাকিস্থান আমলের ২২ পরিবারের মত, এরা আকাশে বাস করে, জমিনের কোন খবর তারা রাখেনা রাখতে চায়ও না। আর গ্রামের কোন সামাজিক, দেশীয় কোন সাংস্কৃতিক অথবা রাজনৈতিক কর্ম-কান্ডে জড়িত হবেনা'।

ভাইয়ের কথায় মনটা খারাপ হয়ে গেল। আগামীকাল ২১শে ফেব্রুয়ারী, সামনে ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস। তারপর আসছে বাংলা নব-বর্ষ। বাড়িতে টেলিভিশন একটা আছে কিন্তু বি,টি,ভি ছাড়া কোন চ্যানেল আসেনা। বি,টি,ভি যেন খালেদা, মওদুদ আহমেদ, সাইফুর রহমান, নাজমুল হুদার বাপের সম্পত্তি। এরা ধরেই নিয়েছেন ইসলামী গুন্ডা-বাহিনী দিয়ে আওয়ামী লীগকে নিঃশেষ করে আজীবন ক্ষমতায় থাকতে পারবেন। পুরো দু-মাস দেশে ছিলাম। ২১শে ফেব্রুয়ারী, ৭ মার্চ, ২৬শে মার্চ, বাংলা নব-বর্ষ, শহীদ দিবস, পতাকা দিবস, স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানের কোথাও, আওয়ামী লীগ, এমনকি শেখ মুজিবের নাম গন্ধই নেই। এক অনুষ্ঠানের নাম ছিল ' বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও শহীদ জিয়া'। সরকারের একান্ত বাধিত পুষ্য বি,টি,ভির চাটুকাররা মনে করে টেলিভিশনের সামনে যারা বসে তারা সবাই ছাগল ভেঁড়া। ঐ অনুষ্ঠানের সম্পাদনা ও উপস্থাপনায় যে ব্যক্তি ছিলেন, তাকে প্রকৃতি চতুষ্পায়ী করে পাঠালে প্রভু-ভক্তির কাজটা বেশ ভালই করতেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিস্মিল্লার পরেই বল্লেন-' স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপনদ্রষ্টা, স্বাধীনতার ঘোষক ও বাংলাদেশের স্থপতি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান----
----'। এক মহিলার রাত দশটায় ইংরেজী সংবাদের প্রথমে, ভাঙ্গা-ভাঙ্গা টানাটানা গলায় 'আস্সালামু আলাইকুম' ও শেষে 'আল্লাহ হাফিজ' বলার কি যে নাটকীয় ভঙ্গিমা, দেখলে বাঁদরেও শরমে মুখ লুকাবে। আজকাল মোল্লারাও কথা

বলার ঢং বেশ বদলায়েছে। স্বাভাবিক অবস্থায় কথা বলে এক সুরে, ওয়াজ করে আরেক সুরে। ওয়াজে কোরআনের আয়াত পড়ে গলার সুর বদলায়ে। সেদিনের খিছুড়ি মোল্লা মুরছালিন আজ আমাদের গ্রামের বড় মস্‌জিদের ইমাম। মুরছালিন জানে পাঞ্জাবীর পকেটে গাঁথা মসজিদের হাই পাওয়ারের মাইক্রফোন তার গলার সুর বদলে দেয়। শুক্রবারে গলাচাপা দিয়ে, কি তালে তালে সুরে সুরে ওয়াজ করে, যেন এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছে। চার সপ্তাহ যাবত বৃষ্টির জন্যে দোয়া করছে এক ফোটা বৃষ্টি বাংলাদেশে পড়তে দেখলাম না। এদেশের মানুষের পেটে ভাত থাক আর না থাক, মানতেই হবে মস্‌জিদ মাদ্রাসা গুলোর কল্পনাতীত উন্নয়ন হয়েছে। খড়ের বেড়া আর শনের ছাউনীর মাদ্রাসা আজ তিনতলা প্রাসাদ। এক একটা মস্‌জিদ নয় যেন শাহজাহানের তাজমহল। আর স্কুলগুলো হয়েছে নুহের প্লাবনের ধ্বংসাবশেষ। কিছুকিছু পাঠশালায় দেখলাম জানালার দু-পাটের মধ্যে এক পাট আছে এক পাট নেই। তিরিশ বছর আগে আমাদের হাইস্কুলে সায়েন্স ল্যাবরেটরী ছিল এখন আর নেই। ছাত্র লাইব্রেরী ছিল, তাও নেই। একদিন স্কুলের অফিস-রুমে মাষ্টার পরেশ বাবুর সাথে আলাপ হলো। জোহরের নামাজের সময় মাষ্টার অফিস-রুমে একা। আমি আমার ছাত্র জীবনের ৭০ থেকে ৭৫ সালের কিছু স্মরণীয় ঘঠনাবলী শুনালাম। মাষ্টার বল্লেন-

- আপনাদের মত দেশ-প্রেমিক, সংস্কৃতি-মনা মানুষের গ্রাম ছেড়ে বিদেশ যাওয়া ঠিক হয়নি।

- শহীদ দিবসে স্কুলের প্রোগ্রাম কি?

- স্কুল বন্ধ থাকবে কোন প্রোগ্রাম নেই।

- স্বাধীনতা দিবসে?

- চার বৎসর যাবত এই স্কুলে চাকরি করছি, ২৬শে মার্চ পালন করতে কখনো দেখিনি। স্বাধীনতা দিবসে স্কুল বন্ধ থাকে আমি আমার গ্রামের বাড়ি চলে যাই।

- আপনার কথা শুনে বুজতে পেরেছি, বাড়ি সিলেট নয়।

- আজ্ঞে না।

- মেয়েরা কালো বোরকা পরে স্কুলে আসে, দু-একটা ছেলের মাথায় দেখলাম টুপি, আপনারা কিছু বলেন না?

- স্কুলের গভর্ণিং-বডির সভাপতি জামাত সমর্থক। ৭ জন শিক্ষকের ৬ জনই ইসলামী মনা। এ দেশে দুই প্রকারের মানুষকে সরকার পুষ্য কুকুর হিসেবে ব্যবহার করে। শিক্ষক আর পুলিশ। একটা কথা বলি মালিক সাহেব। আপনাকে দেখে অবিকল আমার দাদার মত মনে হয়। আমরা যা আলাপ করলাম তা কারো কাছে প্রকাশ করবেন না।

- আপনার দাদা কি করেন?

- দাদা নেই। আমাদের গ্রামের পাঠশালার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার দু-দিন আগে ১৪ ডিসেম্বর রাতে ঘাতকরা তাকে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে যায়। দাদা আর কোনদিন ঘরে ফিরে আসেন নি।

- আপনি কোথায় ছিলেন?

- ভারত।

- আপনি মুক্তিযোদ্ধা?

- হ্যাঁ। ছিলাম, এখন রাজাকার।

পরেশ বাবুর গাল লাল, অশ্রু-শিক্ত নয়ন, কণ্ঠ ভারী হয়ে আসলো। মুখ ফেরায়ে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলেন বেশ কিছু সময়। দেয়ালে বাংলাদেশের মানচিত্র। এক পাশে খালেদা জিয়া অপর পাশে মেজর জিয়া। বাকশক্তি-হীন বোকার মত তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম। পরেশ বাবু বল্লেন-

- ১৪ ডিসেম্বর রাতে পাকিস্থানীদের সাথে গ্রামের কওমী মাদ্রাসার মহতমিম ছিলেন। তিনি এখন এলাকার ইউনিয়ন চেয়ারম্যান। মালিক সাহেব, আপনি আমার বাড়ি আসবেন। আপনাদের পাশের গ্রামের হিরণ বাবুর বোনকে বিয়ে করেছি, আমি তাদের বাড়িতেই থাকি'।

ভাবতেও কষ্ট হয় এ আমার গ্রামের হাইস্কুল। দেশটা কি সত্যই ইসলামী রাষ্ট্র হয়ে যাবে? ব্যর্থ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা? কারো কিছু করার নেই? এতো ত্যাগ এতো রক্ত, সবই অর্থহীন?

২১শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার সারা গ্রামটা ঘুরে দেখলাম। একটা টাইটেল মাদ্রাসা, তিনটা বালিকা মাদ্রাসায় নিয়মিত ক্লাস চলছে। একটা হাইস্কুল, তিনটা প্রাইমারী স্কুল ও একটা শিশু স্কুল, ওগুলো সব বন্ধ। মাদ্রাসাতো দূরের কথা কোন স্কুলই শহীদ দিবস পালন করেনা। সারা দিন হেঁটে হেঁটে কিছুটা ক্লান্ত হয়ে যখন ঘরে ফিরেছি, দেখি একজন লোক বাংলা ঘরে বসে আছেন। দূর থেকে দেখে মনে হয়েছিল চরমোনাইর পীর। কাছে এসে বুঝলাম উনি আমাদের বড় মস্‌জিদের সেই পুরাতন মুয়াজ্জিন হাফেজ কুতুবুদ্দিন। আমাকে দেখেই বল্লেন-
- আস্‌সালমু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সকালে এসেছিলাম তুমি বাড়ি ছিলেনা। আবার আসলাম প্রায় এক ঘন্টা হয়। হুকুম পালন করা মুমিনের ওপর ফরজ। গতরাতে হুকুম পেলাম তোমার সাথে দেখা করার। আল্লাহ পাক আমার সারা জীবনের আজান কবুল করে নিয়েছেন। প্রায়ই সপ্ন-যোগে হজরত ইব্রাহীম (আঃ), হজরত মুসা (আঃ) হজরত নুহের (আঃ) সাথে আমার দেখা হয়। আমার মাথার পাগড়ীটা খেলাফতের নিদর্শন স্বরূপ হুজুরে কেবলা শায়েখ রহমত উল্লা সাহেব দিয়েছেন।
- ছেলে মেয়ে কয়জন?
- আল্লাহর মর্জিতে ৬ মেয়ে ৫ ছেলে। বড় ছেলে টাইটেল পাশ, পরের জন দাওরায়ে হাদিস দিয়েছে, ছোট ছেলে কোরানে হাফিজ। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, তারাও মাদ্রাসার ছাত্রী ছিল। বাকীরা সকলেই মাদ্রাসায় পড়ে, পড়ায় মুটামুটি সবাই ভাল। আল্লাহর মাল আল্লাহই হেফাজত করে। আমার কিছুই করতে হয়না। ছনের কুঁড়েঘর থেকে আল্লাহ কিভাবে আমার ভিটেয় দালান উঠালো, তাঁর কুদরত বুঝা মুশ্কিল। দু বছর আগে বড় বন্যার পর, তোমার মত কয়েকজন লন্ডনী মিলে, কেউ রড, কেউ বালু, কেউ সিমেন্ট এভাবে করে দালান তুলে দিল। আমাকে সাহায্য করায় তারা যে কি শান্তি পায় তারাই জানে। কখন কার কাছ থেকে টিনের টাকা আসবে সেটা আল্লায়ই ভাল জানে।

ভন্ডামী হচ্ছে বুঝতে পেরেছি, কিন্তু মুখ খোলে কিছু বলতে পারলাম না। মানুষটা আমার নিকটাত্মীয় ও বয়সে অনেক বড়। জিজ্ঞেস করলাম-

- এতদিন পরেও টিন ওঠেনি?
- তাইতো এলাম।
- হাফেজ সাহেব, বিষয়টা আপনি মেজো ভাইয়ের কাছে বলেন, একটা সুরাহা হতে পারে।
- আরে না, উনিতো সে সময়েই ১০ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। আমি না হয় কাল-পরশু তোমার সাথে দেখা করতে একবার আসবো। এখন উঠি, 'আল্লাহ হাফিজ'।

কুতুবুদ্দিন চলে যাওয়ার পর পাশের ঘর থেকে বড়ভাই এসে বল্লেন আমি যেন ওকে প্রশ্রয় না দেই। পরে লোক মুখে হাফিজ কুতুবুদ্দিনের পরিবার সম্মন্ধে যা শুনলাম তা খুবই জঘন্য ও অবিশ্বাস্য। তাঁর বড় মেয়ে কোরানে হাফিজ। মেয়ের স্বামী কুয়েত প্রবাসী। স্বামীর অনুপস্থিতে সে তার পিতার আপন চাচাতো ভাইয়ের সাথে রাত্রি যাপন করতো। স্বামী ঘঠনা শুনে টেলিফোনে তালাক দিয়েছে। দ্বিতীয় মেয়ে পিতার ঘরে ছয় বৎসর যাবত আটক। তার স্বামী তাকে ঘরেও নেয় না তালাকও দেয়না।

অনেকদিন পর স্ত্রী হঠাৎ শুধালেন-
- শুনলাম মেজো ভাই নাকি আমাদের ল্যাগেজ ছুটাতে ৮ হাজার টাকা ঘুষ দিয়েছিলেন।
- হ্যাঁ, 'আল্লাহ হাফিজ' এর দেশতো, ঘুষ ছাড়া এ দেশে কিছুই হয়না। আমিও তো একজনকে ঘুষ দিয়েছি।
- আপনি আবার কা-কে ঘুষ দিলেন?
- এয়ারপোর্ট থেকে বাড়ি আসার পথে তুমি বল্লে তোমার বোনের বাসায় উঠে তাঁকে দেখে যেতে। আমাদের দেরী হবে বুঝে ড্রাইভার বল্লো সে তার ভাবীকে দেখতে মেডিকেল যাবে আধ-ঘন্টার জন্যে। আমি বল্লাম, চলো আমিও যাবো। ওসমানী মেডিকেল হস্পিটালের রিসেপ্শনে গিয়ে ড্রাইভার যখন বল্লো সে তার ভাবীকে দেখতে এসেছে, রিসেপ্শনিষ্ট বল্লেন-'সামনে যান, দরজায় লোক আছে দেখিয়ে দেবে'। দরজায় পুলিশের মত ছড়ি হাতে সর্বক্ষণ ত্রস্ত-ব্যস্ত এক ব্যক্তি, কাউকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেয় আবার কাউকে দেয়না। আমাদেরকে দেখে বল্লো 'রিসেপ্শন-কাউন্টার থেকে টিকেট নিয়ে আসেন'। ফিরে এলাম রিসেপ্শনে। আমি বল্লাম- 'উনি তো টিকেট ছাড়া ঢুকতে দেয়না। তিন তলায় ২ নাম্বার রুমে তাহেরা নামের এক রুগীকে দেখতে যাবো, টিকেট দিন। রিসেপ্শনিষ্ট বল্লেন- 'এখানে রুগী দেখার টিকেট দেয়া হয়না। আপনারা তার কাছেই যান। আমি বল্লাম- ' কি আশ্চর্য ! ও বলে আপনার কাছে আসতে, আর আপনি বলেন তার কাছে যেতে। বিষয়টা কি সাহেব'? দুষ্টু হাসি ঠোঁটে চেঁপে উনি বল্লেন-' লন্ডনী সাহেব, দেশে নতুন এসেছেন? বিষয়টা বুঝেন না? গরীব মানুষ দারোয়ানের চাকরী করে। দশ-পাঁচটা টাকা তার হাতে দিয়ে উপরে চলে যান'। 'ঘুষ চাইছেন'? আমি একটু উচ্চস্বরে বল্লাম। ও বল্লো- ' জ্বী না, বক্শিস। আমি খাইনা, ঐ দরজার লোকটার না খেলে চলেনা, গরীব মানুষ তো। সবই আল্লাহ্র ইচ্ছে। যান, দূর থেকে এসেছেন, রুগী না দেখে যাওয়া ঠিক নয়, আল্লাহ্ হাফিজ'।

ড্রাইভার কাতর চোখে আমার দিকে তাকায়। দরজার লোকটাকে বল্লাম 'আমার কাছে বাংলাদেশী টাকা নেই, একটা পাউন্ড আছে নেবেন? চোখের পলকে মানুষটা আমার হাতের মুঠো থেকে পাউন্ডটা এক প্রকার কেড়ে নিয়ে বল্লো, তাড়াতাড়ি যান। 'আল্লাহ্ হাফিজ' 'শয়তান হাফিজ' কিছু বল্লো না। পিপিলীকার মত ব্যস্ত মানুষটা। দরজার সামনে ভিড় ঠেকানো তার দায়ীত্ব। কিন্তু সবাই তো ঘুষ দিতে চায়না, সুতরাং ভিড় জমেই থাকে।
- এক পাউন্ডে কত টাকা হয় জানেন? এক শো একুশ টাকা। আচ্ছা বাংলাদেশের অবস্থা এতো খারাপ আমরা কি কেউ জানতাম?
- খারাপ জেনেও আসতাম। আসতাম আত্মীয় স্বজনদের মায়ায়। মাটির টানে। কুড়ি বছর ইংল্যান্ড কাটালে, সে দেশের কোন কিছু আপন মনে হয়? আমি তো এ দেশের যে দিকেই তাকাই সেদিকেই যেন আমার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই।

দিনের বেলা কাঁঠাল চাঁপা, রাতের বেলা হাসনা-হেনার গন্ধ, আর কোন্ দেশে পাবে? ঐ দেখো কদম গাছের পাতায় পাতায় ফুল ধরেছে এখনো ফোটেনি। কিছুদিন পরেই ফোটবে। তখন গাছটার একটা ফটো তোলতে হবে।

মার্চের প্রথম তারিখ স্পরিবারে সিলেট বেড়াতে গেলাম। যে সিলেটে একজন বিচারক, একজন রাষ্ট্রদুত ও একজন মেয়রকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে সরকারের ইসলামী গুন্ডারা। ঘঠনার যায়গা গুলো একবাব দেখতে হবে। বউয়ের ইচ্ছে তার বোনের বাসায় থাকলে হোটেল ভাড়া বাঁচানো যাবে। আমার ইচ্ছে তালতলা গোলশান হোটেলে থাকবো যেখানে বদরুদ্দিন কামরাণের ওপর বোমা মারা হয়েছিল। হোটেলে থাকবো শুনে ছেলে মেয়েরা খুশি হলো। তারা জেনেছে হোটেলের টি,ভি চ্যানেলে কার্টুন নেট-ওয়ার্ক দেখা যায়। বিকেল বেলা গোলশান কম্যুনিটি সেন্টারের ওপরে ব্যালকনিতে দাড়িয়ে দেখছি ঠিক কোন যায়গায় বোমাটা পড়েছিল। হঠাৎ স্ত্রী বল্লেন-
- আমার বড় ইচ্ছে বাংলাদেশের সিনেমা হলে শুধু আমরা দু'জনে মিলে ছবি দেখার।
- এই বয়সে?
- তাতে কি? লোকে দেখেনা?
- বেবী সীটার কই?
- আমি আপাকে ফোন করে বলে দেবো হোটেলে আসার জন্যে, ততক্ষন তিনি চেলেমেয়েদেরকে দেখাশুনা করবেন'।

একজন ওয়েইটারকে অনুরুধ করলাম লালকুটি, দিলশাদ, রংমহলে খোঁজ নিয়ে জানাতে কোথায় কোন্ ছবি চলছে। ওয়েইটার তার চোখ দুটি আকাশে তোলে বল্লো- ' বলেন কি চাচা, সুশীল সমাজের কেউ সিনেমা হলে যায় ! মোল্লাদের বোমার ডরে ভালমানুষ কেউ আজকাল সিনেমায় যায়না। বাচ্চা-কাচ্চা মেয়েলোক নিয়ে হেঁটে শপিং করতে যাবেন না। শপিং করতে হলে ট্যাক্সী রিজার্ভ করে সোজা আল্-হামরায় চলে যাবেন'।

ঠিক তখনই বাড়ি থেকে মেজো ভাই আমার মোবাইলে ফোন করলেন- ' শায়েখ আব্দুর রহমান স্-পরিবারে সিলেটের শাপলা-বাগে ধরা পড়েছে। ছেলেমেয়ে নিয়ে সিনেমা-থিয়েটারে যাবিনা। সিলেটের রাস্তা-ঘাট তুই এখন টাহর করতে পারবিনা, ভুলেও রিক্সা নিয়ে ঘুরাফিরা করবিনা, সাবধানে থাকিস'।

মনের অজান্তেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো- হায়! এই বাংলাদেশ কি আমরা চেয়েছিলাম। এমনটাতো হওয়ার কথা ছিলনা।

চলবে-